স্যারও চলে গেলেন

কাইউম পারভেজ

১৮ মার্চ্চ ম্যাক্যুয়ারী ফিল্ড কম্যুনিটি সেন্টারে হুমায়ূন ফরীদি স্মরণসভার শেষে কথা প্রসঙ্গে লেখক নাজমুল আহসান শেখকে বলছিলাম - প্রখ্যাত জ্ঞানীগুণি হুমায়ূনরা সবাই চলে যাচ্ছেন। হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী, হুমায়ূন আজাদ, হুমায়ূন ফরীদি। এখন ভয় হয় হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে। তাঁর তো শরীরটা ভালো নেই। ভালো যাচ্ছে না। নাজমুল বললেন - চিন্তা করবেন না তিনি ইনশাল্লাহ সুস্থ হয়ে যাবেন। ক্যান্সার চিকিৎসায় অগ্রগামী পৃথিবীর নাম্বার ওয়ান মেমোরিয়াল স্লোয়ান-কেটেরিং মেমোরিয়াল ক্যান্সার রিসার্স সেন্টার হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছে। দেখা যাক কী হয়।

সেই নাজমুলই শুক্রবার ২০ জুলাই খুব ভোরে এসএমএস করে ম্যাসেজ পাঠিয়েছেন - Humayun Ahmed passed away। তখনই মনে পড়লো ১৮ মার্চ্চ ম্যাক্যুয়ারী ফিল্ড কম্যুনিটি সেন্টারে নাজমুলের সাথে আমাদের কথা গুলো। প্রখ্যাত প্রয়াত এবং বিশিষ্টজন হুমায়ূনদের দলে যোগ হলেন আরেক হুমায়ূন। পৃথিবীর যত প্রান্তে যত বাঙালি আছেন সবাই বাকরুদ্ধ। স্তম্ভিত। শোকার্ত। 'কোথাও কেউ নেই' যার চোখ ভিজে ওঠে নি। 'এইসব দিনরাত্রি'-র মাঝে সবাই এখন শোকে মূহ্যমান।

লেখক হুমায়ূন আহমেদ চলে গেলেন। নাট্যকার হুমায়ূন আহমেদ চলে গেলেন। শুদ্ধধারার চলচ্চিত্রের রূপকার হুমায়ূন আহমেদ চলে গেলেন। অধ্যাপক হুমায়ূন আহমেদ চলে গেলেন। হুমায়ূন আহমেদ স্যার চলে গেলেন। একাই একটি ইনস্টিটিউশন। সেই ইনস্টিটিশনের যে ফ্যাকাল্টীতেই হাত দিয়েছেন সেটাই পরিপূর্ণ এবং সার্থক। গল্প, উপন্যাস, নাটক, চলচ্চিত্র, গান, চিত্রাংকণ, রসায়ণ সবই। আর এই সব ফ্যাকাল্টীর যারা ছাত্র-ছাত্রী অনুরাগী তারা বাংলাদেশের পনেরো কোটি ছাড়িয়ে পুরো গ্লোব জুড়ে। সবার অন্তরে জানান হয়ে গেছে কে চলে গেলো। অন্তরে জানানও দিয়ে গেলো সে কী রেখে গেলো। সে চলেই গেলো। কোটি কোটি বাঙালিকে কাঁদিয়ে চলে গেলো। প্রিয় নুহাস পল্লীতে চিকিৎসাধীনকালে নিউইয়র্ক থেকে ফিরে শেষবার যখন এসেছিলেন তখন কী গেয়ে উঠেছিলেন 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে'.. ..। হয়তো বা। সেই নুহাস পল্লীতেই হবে তাঁর শেষ শয্যা।

স্যার হিসেবেই তাঁর কর্মজীবন শুরু। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহে প্রথম চাকরি রসায়ণের লেকচারার হিসেবে। সে কথা নিজেই লিখেছেন 'দেবতা কি গ্রহান্তরের মানুষ' শিরোনামে এক লেখায়। লিখেছেন .. ' আমার কর্মজীবনের শুরুটা ময়মনসিংহে অ্যাগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটিতে - লেকচারার ভৌত রসায়ণ। .. .. ঢাকার এক ওষুধ কম্পানীতে ভালো চাকরির সুযোগ ছিলো কিন্তু পেশা হিসেবে অধ্যাপনাকে অনেক বেশী আকর্ষনীয় মনে হলো।" পরবর্তীতে আবার ফিরে এলেন তাঁর নিজস্ব বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। শুরু করলেন অধ্যাপনা। পাশাপাশি লেখালিখি। একযোগে গল্প উপন্যাস এবং নাটক। একসময় যখন দেখলেন পড়ুয়ারা তৈরী হয়ে গেছে তাদের শুধু চাই, বই। হুমায়ূন চাই .. হুমায়ূন চাই। ওদিকে চারিদিকে চিৎকার হুমায়ূনের নাটক চাই। চাই.. চাই.. চাই ..। তিনি আর পেরে উঠলেন না। অধ্যাপনা ছেড়ে পুরোদস্তর নেমে পড়লেন আর একের পর এক ফ্যাকাল্টী

খুলে গেলেন। কচিকাঁচা কিশোর কিশোরী যুবা বৃদ্ধ প্রৌঢ় এক কথায় আবালবৃদ্ধবণিতা সবাইকে পড়ুয়া বানিয়ে ফেললেন।

বেইলী রোডে সাগর পাবলিশার্সে মাঝে মাঝে বসতাম। দেখতাম ভিকারুন্নেসার ছাত্রীরা টিফিনে বা স্কুল ছুটির পর ঝাঁকে ঝাঁকে হাজির হতো বই কেনার জন্য। তবে শুধু মাত্র হুমায়ূন। মেয়ের বই কিনতে গিয়ে মা-ও দু'একখানা কিনে নিতেন। তার মধ্যে হুমায়ূনের বই অবশ্যই। তাঁর নতুন বই বেরুচ্ছে এ খবর প্রকাশ হতে না হতেই পড়ুয়াদের তাগাদা। কবে বই আসবে। একদিন তো কয়েক ছাত্রীকে দেখলাম দোকানের রমজান আর আলীর সাথে রীতিমত ঝগড়া -'সেই কবে থেকে বলছেন 'মিসির আলী' আনবেন অথচ আমরা আসলেই বলেন এখনো আসেনি। আমরা কত আশা নিয়ে প্রত্যেকদিন আসি। রমজান ও আলী বলে - আমরা কী করবো বই তো এখনো বের হয়নি। ছাত্রীরা বলে - না আপনারা দেরী করছেন। .. .. মনে মনে বলতাম সার্থক হুমায়ূন স্যার। বইয়ের জন্য আমাদের প্রজন্ম ঝগড়া করছে - কী এক বিপ্লব ঘটিয়ে দিলেন।

আরো এক বিপ্লব ঘটিয়ে দিলেন এক নাটকের অংশ দিয়ে। দেশে তখন এমন এক সময় যখন রাজাকারদের রাজাকার বলা যেতো না। ওরা তো তখন ক্ষমতার অংশীদার। কার বুকের পাটা আছে প্রকাশ্যে তখন ওদের রাজাকার বলে? হুমায়ূন স্যারের ছিলো। পাখিকে শেখানোর নামে ওদেরকে চিহ্নিত করতে উদ্বুদ্ধ করলেন - 'তুই রাজাকার'। রাস্তার ছোট্ট পিচ্চিটাও মার্বেল খেলতে খেলতে বলা শুরু করলো 'তুই রাজাকার'। গোটা দেশ বলতে শুরু করলো 'তুই রাজাকার'। আইন দিয়ে কোন ফাইন করতে পারলো না - আমরা তো সবাই হুমায়ূন আহমেদের নাটকের ডায়ালগ বলছি - 'তুই রাজাকার'। ব্যস শুরু হয়ে গেলো নীরব বিপ্লব। দৈনিক জনকণ্ঠ প্রথম পাতার এক কলামের শিরোনাম করলো 'তুই রাজাকার' দিয়ে। আর সেই কলামে একের পর এক উঠে আসতে লাগলো রাজাকারদের ঠিকুজি এবং নৃশংস কাহিনী।

টেলিভিশনে নাটক দেখার এক নেশা বাঙালির মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন হুমায়ূন আহমেদ। তখন ছিলো 'সবেধন নীলমণি' বিটিভি। 'বহুব্রীহি', 'এইসব দিনরাত্রি' যে রাতে, সে রাতে শহর ফাঁকা। বাসায় পড়ুয়া ছেলেমেয়েরা আগেই স্কুল কলেজের হোমওয়ার্ক শেষ করে নিয়েছে। এমন কী বাড়ীর কাজের মানুষরাও কাজকর্ম শেষ করে টিভির সামনে বসে গেছে। হাজার হোক সৈয়দ বংশের লোক, ওদেরও তো একটা ইজ্জত আছে। সাধ আহ্লাদ আছে। হুমায়ূন আহমেদ ওদের জন্যও লিখেছেন। ওদের কথাও ভেবেছেন। তাঁর কলমে কেউ বাদ যায়নি। তাঁর ক্যামেরায় কেউ বাদ পড়েনি। তিনি ছিলেন সবার। ছোটদের বড়দের সকলের। গরীবের নিঃস্বের বিত্তের - সকলের হুমায়ূন। সকলের চোখের 'কাজল'।

নুহাসপল্লী তাঁর স্বপ্নের পল্লী। মনমত করে তৈরী করেছেন। শহর গ্রাম আধুনিকতা এবং অতি সাধারণতার ছোঁয়া দিয়ে তৈরী এ পল্লী। গাছপালা, মাছ পাখী তাঁর প্রিয় বিষয়াদি। নানান জাতের বিরল প্রজাতির ভেষজ আর ঔষধি গাছ আছে তাঁর বাগানে। নিজেই এর দেখাশোনা পরিচর্য্যা করতেন এবং করাতেন। ময়মনসিংহে আমাদের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু পুরোনো ঐতিহ্যবাহী একটা বোটানিক্যাল গার্ডেন আছে। স্যার মাঝে মাঝে ওখানে বেড়াতে যেতেন। গার্ডেনের কোল ঘেঁসেই ব্রক্ষ্মপুত্র। তো সেই বেটানিক্যাল গার্ডেন থেকে নদীর পাড়েও হাঁটতে যেতেন। এই যে গাছপালার প্রতি মমত্ব - ভেষজ ঔষধির প্রতি নেশা, এগুলো কী তা'হলে সেই কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনগুলি থেকে উদ্বুদ্ধ? হয়তো হ্যাঁ, নয়তো না। তবে তার প্রভাব অবশ্যই ছিলো। হুমায়ূন আহমেদের পক্ষে তা সম্ভব। তিনি জানতেন সৃষ্টির কৌশল। তা সে কাগজে হোক, বা মাটিতেই হোক আর সেলুল্যয়েডেই হোক। হুমায়ূন আহমেদই হুমায়ূন আহমেদ। তাঁর তূলনা তিনি নিজেই।

করুণাময় তাঁর আত্মার শান্তি দিন। তাঁকে ক্ষমা করুন।